Vol. 54 | No. 2 | 2017

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় প্রভাব

Volume	54
Issue	2
Year	2017
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Md. Abdus Sobhan Talukder
Published online	February 1, 2017
DOI	10.62328/sp.v54i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v54i2.2
Pages	১৩-৩০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় প্রভাব

মো. আবদুস সোবহান তালুকদার*

সারসংক্ষেপ : একজন যুগন্ধর মনোবিজ্ঞানীর তত্ত্ব ও দর্শন একজন কালজয়ী মহৎ কথাশিল্পীর সাহিত্যকে যে মহত্তর করে তুলতে পারে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) তার প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শিল্পীজীবনের শুরুতে – অন্তত ১৯৪০ সাল পর্যন্ত – তিনি ছিলেন বিশ শতকের চিন্তাজগতের অন্যতম শীর্ষ নায়ক Sigmund Freud (১৮৫৬-১৯৩৯) দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত। মানিকের ঊনচল্লিশটি উপন্যাসের ভেতরে যে কয়টিতে ফ্রয়েডের প্রভাব প্রত্যক্ষ এবং প্রবল, *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬) সেগুলোর মধ্যে একটি। ফ্রয়েডের মতে, মানুষের নিয়ামক শক্তি হচ্ছে তার অবচেতন মনের জৈব চেতনা; পেটের ক্ষুধা এবং সেটি মিটে গেলে অতঃপর যৌনক্ষুধার পরিতৃপ্তির জন্যেই মানুষ ছুটোছুটি করে বেড়ায়। *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে পদ্মার তীরবর্তী কেতুপুর-চরডাঙা-আমিনবাড়ি-আকুরটাকুর গ্রামে এবং সুদূর ময়নাদ্বীপে পরিব্যাপ্ত কাহিনি-পরিকল্পনায়; বহির্জীবনের বাস্তবতা চিত্রণে; কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবের, কপিলা এবং পরিপ্রেক্ষিত চরিত্র রাসু, বসিরের স্ত্রী, এনায়েতসহ অপরাপর চরিত্রের মনোজগৎ সৃজনে-বিশ্লেষণে – সবত্রই – সিগমুন্ড ফ্রয়েডের প্রভাব প্রত্যক্ষ এবং প্রবল।

পদ্মানদীর মাঝি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস। এই জনপ্রিয়তার কারণ হিসেবে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ করেছেন : 'বিষয়ের অভিনবত্ব', 'পূর্ববঙ্গের সরস ও কৃত্রিমতাবর্জিত কথ্য ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগ', "...উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হইতেছে ইহার সম্পূর্ণরূপে নিম্নশ্রেণি অধ্যুষিত গ্রাম্যজীবনের চিত্রাঙ্কণে সূক্ষ্ম ও নিখুঁত পরিমিতিবোধ, ইহার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সনাতন মানব প্রবৃত্তিগুলির ক্ষুদ্র সংঘাত ও মৃদু উচ্ছ্বাসের যথাযথ সীমানির্দেশ।" (শ্রীকুমার, ১৯৮৮ : ৫১৬) আবু হেনা মোস্তফা কামাল *পদ্মানদীর মাঝি*তে লক্ষ করেছেন মহাকাব্যের ব্যঞ্জনা। (আবু হেনা, ২০০১ : ৩৩) যদিও কেউ কেউ মনে করেন যে : এ উপন্যাসে মানিক "জেলে

---

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জীবনের বিশ্বস্ত ব্যাপক দলিল রচনা করেন নি, তাই চতুর্থ পরিচ্ছেদ থেকেই তিনি সরে গেছেন ওই বাস্তবতা থেকে। (আকিমুন, ১৯৯৩ : ৩৭৬)

১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* এবং *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসদ্বয়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স থেকে *পদ্মানদীর মাঝি* প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালের ২৮ মে। (মাহবুবুল, ২০০১ : ৪২৬) *পুতুলনাচের ইতিকথা* বের হয় ডি.এম. লাইব্রেরী থেকে একই বছরে। হায়াৎ মামুদ জানিয়েছেন : প্রথম প্রকাশের সময় এ গ্রন্থটিতে প্রকাশকাল মুদ্রিত ছিলো না, তবে পরে ১৯৩৬ বলে নিশ্চিত জানা গেছে। (হায়াৎ, ১৯৯৫ : ৭৪৪) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনবোধের বিকাশ ও রূপান্তরের ক্রমধারা নির্ণয়ে একটি প্রতিবন্ধকতা শুরুতেই তাই দেখা দেয় : প্রশ্ন ওঠে, মানিকের তৃতীয় উপন্যাস কোনটি – *পদ্মানদীর মাঝি* না *পুতুলনাচের ইতিকথা? পুতুলনাচের ইতিকথার* প্রকাশ সাল জানা গেলেও প্রকাশের তারিখ নিশ্চিত করে জানা যায় নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে লেখকের রচনাকালই আমাদের সহায়।

পদ্মানদীর মাঝি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ শুরু হয় *পূর্ব্বাশা* পত্রিকার বাংলা ১৩৪১ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে; এবং *পুতুলনাচের ইতিকথা* 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় বাংলা ১৩৪১ সনের পৌষ মাসে। (মাহবুবুল, ২০০১ : ৪২৬) দুটি উপন্যাসেরই রচনাকাল বাংলা ১৩৪১ এবং প্রকাশকাল ইংরেজি ১৯৩৬ সাল হলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় উপন্যাস হিসেবে *পদ্মানদীর মাঝির* দাবি অগ্রগণ্য এই যুক্তিতে যে, এ উপন্যাসটি *পুতুলনাচের ইতিকথার* চেয়ে ছয় মাস আগে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ শুরু হয়েছিল।

পদ্মানদীর মাঝি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে জনপ্রিয়, আলোচিত-সমালোচিত উপন্যাস। ভারতীয় ভাষায় লেখা বইগুলোর ভেতর এ বইটিই সবচেয়ে বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ২০০১ : ৭৫) ফ্রয়েডীয় পরিমণ্ডলে লেখা প্রথম উপন্যাস *দিবারাত্রির কাব্যতে* কাহিনী এবং চরিত্রসমূহ যথার্থ দেশ-কাল ও পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত হয়নি। কার্তিক লাহিড়ীর অনুধাবন :

> এ উপন্যাসের (*দিবারাত্রির কাব্য*) জগৎ অনেকটা কৃত্রিম, এবং হেরম্বর প্রেম-সম্পর্কিত ধারণা অনেকটা বইপড়া জ্ঞানের মতো।... প্রেমকে বৃহৎ পটভূমিতে স্থাপন ক'রে তার উৎস, কারুকার্য আবিষ্কারে তৎপর হলেন পরবর্তী রচনাগুলিতে...। ... অথচ এ সময়েও অর্থনীতির সূক্ষ্ম ও অমোঘ প্রভাবই যে মূল প্রভাব – সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন ব'লেই পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল ভিন্নরূপ ... (কার্তিক, ২০০১ : ২৬০)

এ পর্যায়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনান্বেষা তত্ত্ব-আক্রান্ত নয় (রফিকউলাহ, ২০০০ : ৩২) জীবনকে পরম বলে জেনেছেন বলে মানিক এ পর্বে বহির্বাস্তবতার সমান্তরালে ব্যক্তি মানুষের সঙ্কটকে উপলব্ধি করার প্রয়াস পেয়েছেন। কেননা মহৎ

লেখক মাত্রেই "এ-কথা বোঝেন যে, জীবন শিল্পের থেকে বড় বলেই শিল্প কখনো জীবনের কোলছাড়া হতে পারে না। শিল্পকে খুঁজে ফেরেন তিনি জীবনকে খুঁজতে খুঁজতেই।" (সরোজ, ১৯৮৮ : ৩৪২)

ফ্রয়েডের মতে, মানুষের কেবল দুটি ক্ষুধা আছে – একটি পেটের ক্ষুধা, অপরটি যৌনক্ষুধা। এই দুটো ক্ষুধার পরিতৃপ্তির জন্য মানুষ ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। মানুষের জীবনমুখী সকল কর্মকাণ্ডের মূলে রয়েছে এই বিশাল ক্ষুধা। মানুষের অন্তর্জীবনের নিয়ামক শক্তি তার অবচেতন মনের জৈব চেতনা। *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে পদ্মার তীরবর্তী কেতুপুর-চরডাঙা-আমিনবাড়ি-আকুরটাকুর গ্রামের প্রত্যন্ত জনজীবন বিশ্লেষণ করে তিনি দেখালেন, বহির্জীবনের বাস্তবতাতেও ফ্রয়েড কতোটা প্রাসঙ্গিক। কেবল পদ্মাপারের জনপদেই নয়, সুদূর ময়না-দ্বীপের ক্ষেত্রেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। মানুষের জীবনসংগ্রাম এবং যৌনতাড়না এ উপন্যাসে পাশাপাশি চিত্রিত হয়েছে, যার প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা ফ্রয়েড।

*পদ্মানদীর মাঝি*র কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবের ও কপিলাসহ পরিপ্রেক্ষিত চরিত্র রাসু, বসিরের স্ত্রী ও এনায়েত প্রবলভাবে লিবিডোতাড়িত। বক্ষ্যমান আলোচনায় আমরা মুখ্যত কুবের ও কপিলার; এবং গৌণত রাসু, বসিরের তরুণী স্ত্রী ও এনায়েত চরিত্রের অন্তর্জগৎ বিশেষণ করে এসব চরিত্রের মানসগঠনে ফ্রয়েডীয় প্রভাব অনুসন্ধান করবো।

কুবের পদ্মানদীর মাঝি, যদিও উপন্যাসের শুরুতে তাকে জেলে হিসেবে কিছুকাল কর্মব্যস্ত দেখা যায়। তার স্ত্রী মালা বিকলাঙ্গ হলেও সুন্দরী। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় :

> মালার রং কালো নয়, তামাটে – মাঝে মাঝে তাহাকে বাবুদের বাড়ির মেয়েদের মতো ফর্সা দেখিয়া বসে। জেলেপাড়ার কোনো স্ত্রীলোকের গায়ে এমন চামড়া নাই। একটা পা যদি ওর হাঁটুর কাছ হইতে দুমড়াইয়া বাঁকিয়া না যাইত, কুবেরের ঘরে ও পায়ের ধুলা ঝাড়িতেও আসিত না। (মানিক, ১৯৯৫ : ৩৪৮)

কুবের চার সন্তানের জনক – বড়ো মেয়ে গোপী, এগার বছরের কিশোরী, এর পর দুই পুত্র : চণ্ডী ও লখা, শেষে এক সদ্যোজাত পুত্রসন্তান। সে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে কিন্তু অভাব তার সংসারে ছায়ার মতো নিত্য সহচর। ধনঞ্জয়ের নৌকায় গণেশ সহযোগে সে ইলিশ মাছ ধরে, কিন্তু অসম বণ্টনব্যবস্থা, মালিকের চৌর্যবৃত্তি এবং মাছের পড়তি বাজারমূল্যের দরুন কুবেরের সংসারের অভাব আর ঘোচে না। হোসেন মিয়ার নৌকায় কাজ নেবার পর অবশ্য দুটো পয়সার মুখ দেখতে শুরু করে, যদিও তার সবগুলোই নীতিসম্মত উপায়ে অর্জিত – এমন বলা যাবে না।

কপিলা সুন্দরী, যৌবনবতী রমণী। তার বিয়ে হয়েছে আকুরটাকুর গ্রামের অবস্থাসম্পন্ন কৃষক শ্যামাদাসের সঙ্গে। টাকার অভাব না থাকলেও শ্যামাদাসের

অভাব আছে সাধারণ বিচারবুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞানের। উপরন্তু, সে গোঁয়ার। শীতের শুরুতে স্বামী-স্ত্রীতে কলহ হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে কপিলা রাগ করে বাপের বাড়িতে চলে এলে শ্যামাদাস কপিলাকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার মানসিকতা থেকে আরেকটি বিয়ে করে। ফাল্গুন মাসে কপিলাকে স্বামিগৃহে পাঠানো হলে সেখানে তার ঠাঁই হয় না, তাকে তার 'পশু' স্বামী তাড়িয়ে দেয়। অগত্যা তার আশ্রয় হয় বাবার বাড়ি, যদিও মায়ের দিন-রাত গালমন্দে তার জীবন ওষ্ঠাগত। বন্যাউপদ্রুত চরডাঙায় শ্বশুর বাড়ির খোঁজখবর নিতে এলে শ্যালিকা কপিলার সঙ্গে কুবেরের সাক্ষাৎ ঘটে। উপন্যাসের এই পর্যায়ে কপিলার প্রথম অনুপ্রবেশ। ঔপন্যাসিক কুবেরের স্মৃতিসূত্রে অতীত চিত্রণরীতিতে রূপায়ণ করেছেন কপিলার শৈশব ও দাম্পত্যজীবনের কিছু টুকরো টুকরো ছবি :

> কুবেরের বিবাহের সময়ে বড় দুরন্ত ছিল কপিলা। তখন পঙ্গু মালাকে বিবাহ করিয়াছিল বলিয়াই হয়তো কপিলার দুরন্তপনা অত বেশি চোখে পড়িয়াছিল কুবেরের, অন্ধকারে যে বাস করে মৃদু আলোতে তার চোখ ঝলসাইয়া যায়, চোখ ঝলসানো আলোতে সে হয় অন্ধ। তাহার পর কপিলার বিবাহ হইয়াছে, একটি মেয়ে হইয়া আঁতুড়ে মরিয়া গিয়াছে বছর দুই আগে। কে জানে কত শান্তশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কপিলা আজকাল, কেমন সংসারী হইয়াছে তাহার মন? আর কি কোনোদিন সে গাছের ডালে কাঁচা বেতের দোলনা বাঁধিয়া দোল খাইবে, কিশোর বয়সের অপূর্ব দেহটিকে ঘাটের উপর হইতে ছুঁড়িয়া দিবে পুকুরের জলে, ডিঙি লইয়া একা একা পলাইয়া গিয়া সকলকে দিবে বকুনি দেওয়ার শাস্তি? রাগের মাথায় এ জীবনে আর কখনো হয়তো সে কুবেরকে চ্যালাকাঠ ছুঁড়িয়া মারিবে না। না মারুক! একজন চ্যালাকাঠ ছুঁড়িয়া মারিবে না বলিয়া আফসোস করিবার কী আছে? খানিক পরে পাশাপাশি দুটি বাঁশের উপর দিয়া কপিলাকে ঘরের দিকে যাইতে দেখিয়া কুবেরের দুচোখ ঝাপসা হইয়া আসিল। (মানিক, ১৯৯৫ : ৩৫১)

বন্যার পানি শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কেতুপুরে তার বাড়িতে গিয়ে থাকার জন্য কুবের শ্বশুর বাড়ির সবাইকে নিমন্ত্রণ করে। জামাতার এই ঔদার্যে সবাই মুগ্ধ হলেও বাস্তবতার কারণে সবার যাওয়া সম্ভব হয় না। ঠিক হয় : ছেলেমেয়েগুলো যাবে, তাদের দেখাশোনা করার জন্য সঙ্গে যাবে কপিলা। বেড়াতে যাবার উপলক্ষে কপিলা বেশ সেজেছে। লেখকের বর্ণনা :

> কপিলা খুব সাজিয়াছে। চুলে চপচপে করিয়া দিয়াছে নারিকেল তেল, গায়ে হলুদ মাখিয়া করিয়াছে স্নান, পরিয়াছে তার বেগুনি রঙের শাড়িখানি। স্বামী ত্যাগ করিয়াছে বটে, বয়েস তো তার কাঁচা। (মানিক, ১৯৯৫ : ৩৫২)

ঝোঁকের মাথায় কুবের সবাইকে নিমন্ত্রণ করে বটে, কিন্তু তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা কী ভাবে করবে, তা নিয়ে সে স্বস্তি পায় না। তার মানসভাবনা প্রকাশ করেছেন লেখক সুনিপুণভাবে :

> ক. এদিকে স্বস্তি নাই কুবেরের। তার মতো গরিব কে আছে জগতে? এই যে এতগুলি মানুষ আসিল বাড়িতে ইহাদের সে খাওয়াইবে কী। আউশের ফসল নষ্ট হওয়ায় এবার যে দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে এখন হইতে তাহা টের পাওয়া যায়। জলমগ্না পৃথিবীতে আহার্যের মূল্য বাড়িয়াছে। ইলিশের মরসুম বলিয়া এখন যদি বা কোনো রকমে চলিয়া যায়, তারপর? দু-চার পয়সা জমাইবার আশা ঘুচিয়া গেল। (মানিক, ১৯৯৫ : ৩৫২)
>
> খ. কুবের এইমাত্র খাইয়া উঠিয়াছে, তবু তাহার নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আরো কয়েকটা প্রাণীকে সারি দিয়া বসিয়া খাইতে দেখিয়া ভবিষ্যতের অনিবার্য ক্ষুধায় তার ভরা পেটের অন্ন যেন মুহূর্তে হজম হইয়া যায়। মালা বসিয়া বসিয়া সকলের খাওয়ার তদ্বির করে, গোপীর পাতের ডালমাখা ভাতটুকু সে আদর করিয়া তাহার ভাইয়ের পাতে তুলিয়া দেয় – এ দৃশ্য কুবের আর দেখিতে পারে না। নৌকায় গিয়া সে বসিয়া থাকে। (মানিক, ১৯৯৫ : ৩৫৩)

একটি ব্যাপার লক্ষণীয় : অতিথি আগমনে যে কুবের ঘরের প্রতি একটু আগেই বিতৃষ্ণা বোধ করেছে, কপিলার লীলাপরায়ণতায় সে গৃহের প্রতিই সে সহসা আকর্ষণ বোধ করে। সন্ধ্যাবেলায় নির্জন নদীতীরে কুবেরের সাথে কপিলার ভিন্নতর পরিচয় ঘটে। মেজাজের আকস্মিক ঊর্ধ্বগতির জন্য কুবের তামাক না নিয়েই মাছ ধরার নৌকায় আগেই চলে এসেছে – ধনঞ্জয় ও গণেশ তখনো এসে পৌঁছেনি। তাকে তামাক পৌঁছে দেবার ছলে কপিলা এসে ছলাকলা শুরু করে দেয়। 'খাটাসের মতো' হাসতে হাসতে বলে : ডরাইছিলা, হ? আরে পুরুষ! (মানিক, ১৯৯৫ : ৩৫৩) তারপর বলে, আমারে নিবা মাঝি লগে? (মানিক, ১৯৯৫ : ৩৫৩)

তাচ্ছিল্য করে কপিলা কুবেরকে এ উপন্যাসে বারবার 'আরে পুরুষ' বলে বিদ্রূপ করেছে মূলত তার বন্যপৌরুষ জাগানোর জন্য, এবং 'আমারে নিবা মাঝি লগে?' বলে নিজেকে যেমন সমর্পণ করেছে, তেমনি কুবেরের আদিম বাসনাকে উসকানি দিয়েছে। নিরীহ ও গোবেচারি কুবের প্রথমদিকে কপিলার এসব ছলাকলা বুঝতে পারে না :

> কপিলা আব্দার করিয়া কুবেরের হাত ধরিয়া টানাটানি করে, চিরদিনের শান্ত নিরীহ কুবেরকে কোথায় যেন সে লইয়া যাইবে। মালার বোন না কপিলা? হ। কুবের তাহার দুই কাঁধ শক্ত করিয়া ধরিয়া অবাধ্য বাঁশের কঞ্চির মতো তাহাকে পিছনে হেলাইয়া দেয়, বলে, 'বজ্জাতি করস যদি, নদীতে চুবানি দিমু কপিলা।'
>
> কপিলা ধপ করিয়া সেইখানে কাদার উপরে বসিয়া পড়ে, হাসিতে হাসিতে বলে, 'আরে পুরুষ!'
>
> তাহার নির্বিবাদে কাদায় বসা আর শয়তানি হাসি আর খোঁচা দেওয়া পরিহাস – সব বড় রহস্যময় ও দুর্বোধ্য। হঠাৎ কুবেরের বড় ভয় হয়। সে সস্নেহে বলে, 'পাঁক মাইখা মরস কেরে কপিলা? মাইন্‌ষে কইব কী? যা বাড়িত্ যা।'
>
> কে জানে কী আছে কপিলার মনে? (মানিক, ১৯৯৫ : ৩৫৩)

সন্ধ্যাবেলার এই ঘটনাটি কুবেরের জীবনধারায় বড়ো রকমের পরিবর্তন সূচিত করে। বেগুনি রঙের শাড়িটি পরে চুলে চপচপে তেল দিয়ে কপিলা শুধু লীলাখেলা করতেই পটু নয়, কুবেরের সেবাও সে করে – জীবনে কখনো কুবের যে সেবা পায় নি। সারারাত পদ্মার বুকে কাটিয়ে এসে এখন সে না চাইতেই পা ধোয়ার পানি পায়, ভাতের জন্য হাঁকডাক করতে হয় না, খাওয়া শেষ হলেই তামাক চলে আসে, প্রস্তুত থাকে তার দীনমলিন শয্যা। সুযোগ পেলেই কোনোদিন গোঁফ ধরে টান দিয়ে, কোনোদিন চিমটি কেটে, হাসি চেপে রেখে চোখের পলকে উধাও হয়ে 'ঘুম আসিবার আগেই কপিলা তাহকে স্বপ্নও আনিয়া দেয়।' তাই : পরের পেট ভরাইতে ফতুর হইতে বসিয়াও গৃহে তাই কুবেরের আকর্ষণ বাড়ে। (মানিক, ১৯৯৫ : ৩৫৩)

পুরুষসঙ্গবঞ্চিত কপিলাও বাবার বাড়িতে থাকার চেয়ে ভগ্নিপতির বাড়িতে থাকতেই আগ্রহ বোধ করে। বড়ো ভাই অধর তাই তাকে পিতৃগৃহে নিয়ে যাবার জন্য তাড়া দিলেও সে চলে যায় না, বরং 'ঝগড়া করিয়া গাল দিয়া অধরকে সে ভাগাইয়া দেয়।' পূজার সময় আবার আবির্ভাব ঘটে অধরের। সে রাগারাগি পর্যন্ত করে কপিলাকে নিয়ে যাবার জন্য, কিন্তু কপিলা যায় না, বরং না যাওয়ার ছুতা সন্ধান করে। কুবেরও তার পক্ষে সাফাই গায় :

> কপিলা গেল না। বলিল, 'কেন, ঘর পড়িয়া গিয়া ঢেঁকিঘরটাতে যখন তাহারা সকলে একসঙ্গে মাথা গুঁজিয়া ছিল, অসুবিধার অন্ত ছিল না, তখন অধর আসিতে পারে নাই? এখন নূতন ঘর উঠিয়াছে, থাকিবার কোনো অসুবিধা নাই, এখন সে যাইবে কেন এদের এই বিপদের মধ্যে ফেলিয়া?' কুবেরও ইহাতে সায় দিয়া বলিল, 'হ, কেন যাইবে কপিলা তাদের এই বিপদের সময়? (মানিক, ১৯৯৫ : ৩৫৯)

পুরুষসান্নিধ্যবঞ্চিত, স্বামী পরিত্যক্তা কপিলা জীবনতৃষ্ণার নিবৃত্তির জন্য পুরুষসঙ্গ প্রত্যাশা করে। সে কেবল তলারটাই কুড়ায় না, গাছেরটাও পাড়ে। জমিদার বাড়ির কর্মচারী শীতল বাবুকে দৃশ্যপটে এনে পূজামণ্ডপে তার সাথে কপিলার মাখামাখি-হাসাহাসি – 'নির্লজ্জ আচরণ'– দ্বারা সুকৌশলে লেখক কপিলা চরিত্রের এই সূক্ষ্ম দিকটি উন্মোচন করেছেন। শীতল বাবুর সাথে কপিলার মাখামাখি ধরনের ঘনিষ্ঠতা কুবেরকে সঙ্গত কারণেই ঈর্ষাবিদ্ধ ও অভিমানী করে তোলে। ছেলে লখাকে নিয়ে সে পূজামণ্ডপ থেকে বেরিয়ে আসে। বাড়ির পথে জোরে জোরে পা ফেলে সে। তার মানসচিন্তাটি ঔপন্যাসিক প্রকাশ করেছেন এভাবে :

> একটু পথ গিয়াই গতি তাহার হইয়া আসিল মন্থর। না, কপিলার জন্য ফিরিয়া সে যাইবে না, তবে আস্তে আস্তে হাঁটিতে দোষ নাই। কপিলা আসিয়া সঙ্গ নেয় তো নিক। অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। কপিলাকে একা ফেলিয়া যাওয়া ঠিক কর্তব্য হইবে না। হয়তো শীতলকেই সে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে বলিবে। এতখানি অন্ধকার রাস্তা শীতলের সঙ্গে হাঁটিয়া চলিবে কপিলা? তার চেয়ে বিড়ি কিনিবার ছলে এখানে কুবেরের দাঁড়ানোই ভালো। (মানিক, ১৯৯৫ : ৩৬০)

ইতোমধ্যে কপিলা এসে পড়ে। কৌশলে ভাগ্নে লখাকে সে প্রতিমাদর্শনার্থী শীতল বাবুর স্ত্রী যুগীর হাতে সমর্পণ করে নিরালায় কুবেরের মুখোমুখি হতে চায়। তার লক্ষ্য : শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি। ঈর্ষা, অভিমান আর ক্ষোভে ফুঁসতে থাকা কুবের যখন 'তেঁতুল গাছের তলে পথের যেখানে দুর্ভেদ্য অন্ধকার রচিত হইয়াছে সেখানে' হঠাৎ শক্ত করে কপিলার আঁচল চেপে ধরে বলে, 'শীতলের লগে অত কথা কিসের তর, আঁই?' তখন কপিলা 'রাস্তার মদ্যি, ইডা কেমনতর কাণ্ড জুড়লা?' বলে বটে, কিন্তু সে আঁচল টেনে যথাস্থানে পুনঃস্থাপন করার কোনো চেষ্টা করে না, বরং 'কুবের তাহাকে জড়াইয়া ধরিলে শান্ত হইয়া থাকে'। কুবের আরো অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে অবশ্য কপিলা পিছিয়ে আসে। সে বলে, 'মনডা ভালো না মাঝি, ছাড়বা না? মনডা কাতর বড়।' এতে কুবেরের রেশ কেটে যায়। কপিলাকে সে ছেড়ে দেয়। 'তর মন কাতর ক্যানরে কপিলা?' প্রশ্নে কপিলা বলে 'সোয়ামীরে মনে পড়ে মাঝি'।

কপিলার এই বিষণ্ন উক্তিতে নারীর চিরায়ত অস্তিত্বের সংকট ধরা পড়েছে। স্বামী পরিত্যাক্তা বলেই সে বৈধভাবে পুরুষসান্নিধ্যবঞ্চিত, আর সেই কারণেই কখনো শীতল, কখনো কুবেরের মন জুগিয়ে তাকে চলতে হয়। নারী জীবনের ইচ্ছাবিরুদ্ধ লাঞ্ছনার শিকার হয়ে তাই কপিলার মুখ থেকে স্বগতোক্তির মতো বেরিয়ে আসে, 'সোয়ামীরে মনে পড়ে মাঝি'।

কপিলা চরিত্রের কয়েকটি দিক লক্ষণীয়। সে তার জীবন তৃষ্ণার নিবৃত্তি চায়। তবে সমাজসম্মত পথ খোলা থাকতে সমাজনিন্দিত পথ সে বেছে নেয়নি। যখন সমাজসম্মত পথ তার সামনে খোলা নেই, কেবল তখনই সে সমাজনিন্দিত পথে পা বাড়ায়। বিবাহপূর্বকালে এবং আকুরটাকুরে স্বামিগৃহে থাকাকালীন সে অন্য কোনো পুরুষকে প্রলুব্ধ করেছে, এমন কোনো প্রমাণ উপন্যাসে নেই। পরপুরুষের জন্য তৃষ্ণা তার প্রকাশ পেয়েছে যখন সে স্বামী পরিত্যক্তা, নতুবা ওই সময়, যখন দৃশ্যপটে তার স্বামী অনুপস্থিত। দ্বিতীয়ত, সে যখন পরপুরুষকে প্রলুব্ধ করে, তখন টানে-ঢিলে রাখার একটি কৌশল সে অবলম্বন করে। একটু লীলাপরায়ণ না হলে পুরুষকে আকর্ষণ করা যায় না; আবার তাকে দেহ-মন-প্রাণ উজাড় করে সবকিছু সমর্পণ করার পরে যে পুরুষের আকর্ষণে ভাটা পড়ে – এও তার ভালো করেই জানা। তাই রাত বিরেতে কুবের তাকে জড়িয়ে ধরলে সে যেমন নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় না, তেমনি তার চেয়ে বেশি দূর অগ্রসর হতে তাকে সায়ও দেয় না। পুরুষকে কী ভাবে টানতে হয়, কাতোটা কাছে আর কতোটা দূরে রাখলে আকর্ষণ বজায় থাকে, এ বিষয়ে কপিলার বিশেষ জ্ঞান ছিলো। গ্রাম্য, দরিদ্র, অশিক্ষিত একটি নারী মনস্তাত্ত্বিক এই প্রত্যয় কী ভাবে অর্জন করলো – এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠতে পারে। প্রেমের বিচিত্র গতি-প্রকৃতি, তার আকর্ষণ-বিকর্ষণের রহস্যময় তত্ত্ব এই গ্রাম্য যুবতীর জানার কথা নয়। ফ্রয়েড প্রভাবিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপন্যাসে কপিলা চরিত্রের ওপর ফ্রয়েডীয় জীবনদর্শন মেলাবার প্রয়াস পেয়েছেন বলেই এমনটি ঘটেছে।

মহকুমা শহর আমিনবাড়ি হাসপাতালে গোপীকে ভর্তি করার পর সবাই কেতুপুর ফিরে গেলেও কপিলা জিদ করে কুবেরের সঙ্গে থেকে যায়। "কেহ তাহাকে টলাইতে পারিল না। কুবের কত বলিল, নিজে সে কোথায় থাকিবে ঠিক নাই, মেয়ে মানুষ সঙ্গে থাকিলে কত হাঙ্গামা, কত অসুবিধা – তাছাড়া লোকে বলিবে কী? কপিলা কোনো কথাই কানে তুলিল না।" কুবেরের সঙ্গে একান্তভাবে রাত কাটানোর সুযোগ সে হাতছাড়া করতে নারাজ। এমন কি এ জন্য কলঙ্ক নিয়েও সে ভাবিত নয়। কুবেরের 'সোয়ামী শুইনা কী কইব তর ভাবছসনি' প্রশ্নের জবাবে সে অবলীলায় বলে 'কউক!' এ পর্যায়ে কুবেরের মানসভাবনা প্রকাশ করেছেন লেখক এভাবে : শুধু গোপীর জন্যই কি কপিলা রহিয়া গেল? গোপীকে সে এত ভালবাসে? কে জানে! কপিলার মন বুঝিবার ক্ষমতা ভগবান কুবেরকে দেন নাই। (মানিক, ১৯৯৫ : ৩৬৩)

নির্জনে একান্ত নিশিযাপনে মরিয়া হয়ে উঠেছিল কপিলা, কুবের নয়। সন্ধ্যাবেলা গোপীকে দেখে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে কুবের বাড়ি ফেরার অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু সফল হয় না। অতঃপর কপিলার প্ররোচনায় ছ আনা ব্যয়ে হোটেলে চাঁটের বেড়ায় আচ্ছাদিত ঘরের অংশবিশেষ ভাড়া করে। একত্রে নিশি যাপনের প্রশ্নে কপিলা পূর্বাপর অনড় থাকলেও কুবের দ্বিধাহীন হতে পারে না। লেখকের বর্ণনা :

> কুবের উঠিয়া দাঁড়ায় বলে, 'শো কপিলা।'
>
> 'তুমি কই যাও?'
>
> 'উই পাটিতে শুই গিয়া আমি, যামু কই?'
>
> ক্ষীণ ভীরু কণ্ঠে কপিলা বলে, 'না, যাইও না মাঝি।'
>
> কুবের কি রাগিয়া যায়? কড়া সুরে জিজ্ঞাসা করে, 'কী করুম তবে?'
>
> 'ডরামু মাঝি।'
>
> কী আর করিবে কুবের, আবার সে পাটিতে বসে। কপিলা তাহার চাদরখানা পুঁটুলি করিয়া তাহাকে বালিশ করিয়া দেয়। (মানিক, ১৯৯৫ : ৩৬৪-১৬৫)

তবে রাত্রিযাপন শেষে পরদিন সকালে কপিলার যে লজ্জাবোধ, তা মূলত তার অপরাধবোধ থেকে উদ্ভূত :

> পুরুষের দৃষ্টিপাতে আজ বড় লজ্জা করিতেছে কপিলার, দিনের আলোয় আজ তার মনে হইতেছে জগৎসুদ্ধ সকলেই বুঝি জানে যার পাশে শুইয়া সে রাত কাটাইয়াছে স্বামী সে তাহার নয়। (মানিক, ১৯৯৫ : ১৬৫)

দু দিন পর কুবের আবার যখন আমিনবাড়ি হাসপাতালে মেয়েকে দেখতে যায়, তখন কপিলা তার সাথে যাবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। কিন্তু মালার অনিচ্ছা, সর্বোপরি কুবেরের ভীরুতার জন্য তার আর যাওয়া হয়ে ওঠে না।

পরদিন হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে কুবের দেখে কপিলার স্বামী শ্যামাদাস এসেছে। দ্বিতীয় স্ত্রী মারা যাওয়ায় কপিলাকে সে নিতে এসেছে। শ্যামাদাসকে দেখে কুবের ঈর্ষাবোধ করে, স্বামীর সঙ্গে কপিলার ছলাকলায় সে ক্ষুব্ধ হয়। অবহেলা পেয়ে সে অভিমানও করে। কপিলার কাছে তেল চেয়ে না পেয়ে সে :

> বাঁশের পাত্রটি তার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া এই দুপুরবেলায় অভুক্ত অবস্থায় গ্রামের ভিতর গিয়া দু পয়সার তেল কিনিয়া আনিল। কপিলাকে দেখাইয়া দাওয়ায় বসিয়া সর্বাঙ্গে ঘষিয়া ঘষিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া সে তেল মাখিল, নিজের দেহটিকে সে যেন কপিলার চুলের মতোই তেলে জবজবে করিয়া ছাড়িবে। (মানিক, ১৯৯৫ : ৩৬৮)

অভিমান করে কপিলার সঙ্গে সারাদিন সে কথা বলে না। এবং মাছ ধরতে যাবার সময় তামাকের গোলা সঙ্গে করে নিয়ে যায় না এই আশায় যে, কপিলা তাকে নৌকায় পৌঁছে দিয়ে আসবে। নৌকায় বসে বসে সে কপিলার প্রত্যাশা করে কিন্তু তার সে প্রত্যাশা পূরণ হয় না। পরদিন কপিলা স্বামীর সাথে চলে যায়।

কপিলা চলে যাবার পর কুবের কাজে মন দিতে পারে না। সারাক্ষণ কপিলার ভাবনা তার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। জগা মাঝির স্ত্রী কপিলার মতো করে হাঁটে বলে অন্যমনস্ক হয়ে কুবের তার পেছন পেছন গিয়ে বিব্রত হয়।

অশান্ত মনের তাগিদে কুবের একদিন ভোর-ভোর বেলা গোপীকে আনার নাম করে বার-তের মাইল পাঁয়ে হেঁটে আকুরটাকুরে কপিলার স্বামিগৃহে গিয়ে উপস্থিত হয়। স্বামিগৃহে কপিলা যে বিশেষ সুখে আছে, তা বোঝা যায় তাকে দেখেই :

> ডুরে শাড়ি পরিয়াছে কপিলা, চুলের তেলে কপাল তাহার ভিজিয়া গিয়াছে। দেহ যেন উথলিয়া উঠিয়াছে কপিলার বর্ষার পদ্মার মতো। কী ভীষণ খুশি মনে হইতেছে কপিলাকে! নিজের মলিন কাপড় ও চাদরটির লজ্জায় কুবেরের ছুটিয়া পলাইতে ইচ্ছা হইতে থাকে। (মানিক, ১৯৯৫ : ৩৮৪)

একা বসে বসে কুবের ভাবে। ময়নাদ্বীপের এনায়েতের ও বসিরের স্ত্রীর প্রণয়দৃশ্যের কথা তার মনে পড়ে যায়। এনায়েতকে সে ঈর্ষা করতে শুরু করে। বসে থাকতে থাকতে পথ চলার শ্রান্তিতে ঘুম আসে কুবেরের। 'আধজাগা আধ-ঘুমানো অবস্থায় সে স্বপ্ন দেখিতে থাকে, রচনা করিয়া চলে আকাশকুসুম' :

> সর্বশক্তিমান হোসেনকে সে যেন বলিয়াছে, কপিলাকে পাইলে সপরিবারে সে ময়নাদ্বীপে গিয়া বাস করিবে – গণেশকেও বলিয়া সে রাজি করিবে যাইতে। হোসেন তাহার চিরন্তন হাসি হাসিয়া যেন বলিয়াছে, তাই করুম, কুবির বাই, তাই করুম – আইনা দিমু কপিলারে। (মানিক, ১৯৯৫ : ৩৮৪)

সুবচনীর হাটে যাবার ছল করে কুবের আকুরটাকুরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কপিলার কাছে তার আসল উদ্দেশ্য চাপা থাকে না, উপরন্তু, হাটবার আজ নয়, আগামী কাল – এই তথ্য প্রকাশ করে কপিলা যখন তাকে পরিহাসছলে 'হাটে গিয়া ঘুমাইয়া থাকগা মাঝি, কাইল হাট কইরা বাড়িত যাইও' বলে, তখন কুবের লজ্জিত ও অপমানিত হয়। তাই শ্যামাদাসের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও কুবের আর থাকতে রাজি হয় না।

অভিমানী কুবের সুবচনী হাটে এক ময়রার দোকানের বেঞ্চে গিয়ে শুয়ে থাকে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, জ্বরগ্রস্ত হয়ে তাকে আবার ফিরে আসতে হয় কপিলার বাড়িতেই। 'পরের ঘরের বৌ' কপিলার পক্ষে স্বামিগৃহে কুবেরের প্রত্যাশিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করা সম্ভব হয় না। পাট ও পাঁঠার দুর্গন্ধে ছোট একটি ঘরে একা একা থাকতে হয় কুবেরকে। পরদিন জ্বর ছাড়ার পর রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে-অভিমানে কুবের যাবার সময় বলে : গরু-ছাগল ভাবস আমারে তুই, খেলা করস আমার লগে। তরে চিনা গেলাম কপিলা, পরনাম কইরা গেলাম তরে। (মানিক, ১৯৯৫ : ৩৮৬)

কুবেরের শান্ত, গতানুগতিক জীবন ধারায় কপিলা স্পষ্টতই একটি বড়ো ধরনের পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। সে বুঝতে পারে : তার জীবনটা বদলে দিয়েছে কপিলা :

> অল্প সময়ের মধ্যে অকস্মাৎ অনেকগুলি বিচিত্র অভিজ্ঞতা কুবেরকে যেন নতুন মানুষ করিয়া দিয়াছে, নদী ও নদীতীরের একটানা জীবনে তাহার গত কয়েকটি মাস চিরস্মরণীয়। কোথায় ছিল কপিলা, কোথায় ছিল আশ্বিনের ঝড়, কোথায় ছিল ময়নাদ্বীপ! সব একসঙ্গে ভিড় করিয়া আসিয়াছে তাহার জীবনে। (মানিক, ১৯৯৫ : ৩৮৬)

প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির সমপাতন না ঘটলেও কপিলার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ এলে কুবের তা হেলায় হারাতে চায় না। তাই অধরের নিকট থেকে সে যখন জানতে পারে যে কপিলা চরডাঙায় বেড়াতে এসেছে, কদিন থাকবে, তখনই সেখানে যাবার জন্য কুবের ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তার ব্যাকুলতা স্মৃতি ও স্বপ্ন দ্বারা সংকলিত :

> মনে পড়ে শুধু কপিলাকে, কপিলার লীলা-চাপল্য, কপিলার হাসি ও ইঙ্গিত, তেলে-ভেজা চুল ও কপাল আর বেগুনি রঙের শাড়িখানি। আর মনে পড়ে শ্যামাদাসের উঠানে ভোরবেলা গোবর লেপায় রত কপিলাকে, মালাকে বলিবার অনুরোধ মেশানো তার শেষ সকাতর কথাগুলি। ক্যান আইছিলা মাঝি, জিজ্ঞাসা করিয়াছিল না কপিলা? হ, ও জিজ্ঞাসার মানে কুবের বোঝে। আবার তাই যাইতে চায় কুবের কপিলার কাছে, এখনি যাইতে চায় শস্যহীন শুকনো মাঠগুলি উর্ধ্বশ্বাসে পার হইয়া চরডাঙায়, কপিলা যেখানে চুল বাঁধিতেছে। – কুবেরকে দেখিয়া তাহার বোতলটি কাত করিয়া আরো খানিকটা তেল মাথায় ঢালিবে কপিলা : তার উত্তোলিত দুটি বাহু, মুখের ছলনাভরা হাসি, বসিবার দুর্বিনীত ভঙ্গি সব পাগল করিয়া দিবে কুবেরকে। (মানিক, ১৯৯৫ : ৩৯৪)

দুই ছেলেকে সঙ্গে করে সে চরডাঙায় যায়। কুশল জিজ্ঞাসার এক পর্যায়ে তার 'ক্যানরে কপিলা, অসুখ নি করছে তর?' প্রশ্নের জবাবে কপিলা অকপটভাবে বলে, 'মনডার অসুখ মাঝি, তোমার লাইগা ভাইবা ভাইবা কাহিল হইছি'; কিন্তু বলতে বলতেই আঁচলের আড়াল থেকে এক ভাঁড় চুন হলুদ সে কুবেরের গায়ে ঢেলে দিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে, সে আগের মতোই লীলাপরায়ণ।

পুকুর ঘাটের লীলাপর্ব এরই ধারাবাহিকতায় সম্পন্ন, সাহসিকতায় উত্তীর্ণ :

> কাদা ধুইয়া স্নান করিয়া আসিবার উদ্দেশ্যে কুবের গেল পুকুরে। কপিলা বুঝি টের পাইয়াছিল। খানিক পরে সেও পুকুরঘাটে আসিয়া হাজির।
>
> 'আমারে রং দিলা না মাঝি?'
>
> 'পাঁক দিমু কপিলা? রং ত নাই!'
>
> দূর অ! রং নাই, পাঁক দিবার চায়! দিও না মাঝি পাঁক, দিও না কইলাম!'
>
> পাঁক দিতে বারণ করে কপিলা কিন্তু পা পিছলাইয়া কাদা মাখিয়া জলে সে গড়াইয়া পড়ে। হাতের ঠেলায় কলসী ভাসিয়া যায় কুবেরের দিকে। কপিলা বলে, 'ধর মাঝি, কলস ধর।'
>
> বলে, 'আমারে ধর ক্যান? কলস ধর।'
>
> হ, ভীত চোখে চারিদিকে চাহিয়া কলসীর মতোই আলগোছে কপিলা ভাসিয়া থাকে, তেমনি ত্রাসের ভঙ্গিতে স্তন দুটি ভাসে আর ডোবে। চোখের পলকে বুকে কাপড় টানিয়া হাসিবার ভান করিয়া কপিলা বলে, 'কথা যে কও না মাঝি?'
>
> কুবের বলে, 'তর লাইগা দিবা-রাত্র পরানডা পোড়ায় কপিলা। (মানিক, ১৯৯৫ : ৩৯৫-১৯৬)

গোপীর বিয়েতে কপিলা আবার কেতুপুর আসে। এবার কপিলা অনেক পরিণত, অনেক পরিবর্তিত। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য :

> সরিয়া সরিয়া পলাইয়া বেড়ায় কপিলা, ঢেঁকিঘরের ভিতরে দাঁড়াইয়া কুবের ইশারা করিয়া কাছে ডাকিলে মুখ ঘুরাইয়া থাকে। এ তো ছলনা নয়, খেলা নয় কপিলার। কী যেন ভাবিয়া আসিয়াছে কপিলা এবার, বড় সে গম্ভীর। একটু হাসি, দুটি কথার কাঙাল কুবের, কপিলার হাসি কই? কথা কই কপিলার মুখে। (মানিক, ১৯৯৫ : ৩৯৭)

শুধু লীলালাস্যে নয়, একান্তভাবেই সে কুবেরের সঙ্গী হতে চায়। কিন্তু কোনো পথ সে খুঁজে পায় না।

যে পুরুষ মানুষটি তার দেহমন জুড়ে আছে, সে তারই বোনের একমাত্র অবলম্বন – এ দায় যেমন সে এড়াতে পারে না, তেমনি তার দেহমনের সব দাবিও সে উপেক্ষা করতে পারে না। উভয় সঙ্কটের জন্যই তার এ অভূতপূর্ব গাম্ভীর্য। উপন্যাসের শেষে

কুবেরের সঙ্গে তার ময়নাদ্বীপে চলে যাওয়া তাই কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং বলা যায় : কুবের-কপিলার সমাজনিন্দিত প্রেমের এ এক অনিবার্য পরিণতি। সেই রাত্রিটির কথা পুনর্বার স্মরণ করা যাক : মাইল দশেক উজানে গিয়ে নৌকায় পাট বোঝাই করে দেবীগঞ্জে যখন সে ফিরে এলো, তখন রাত অনেক হয়েছে। সবাই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তাই অত রাতে কেউ কেতুপুর ফিরতে রাজি হলো না। বাড়িতে যেহেতু রয়েছে কপিলা, তাই কুবেরের মন পড়ে ছিলো বাড়িতে। তাই নদীর ধার ধরে সে গ্রামের দিকে হাঁটতে শুরু করে। একাকী পদযাত্রায় কপিলাকে নিয়ে স্বপ্নবিলাস তাকে সুখ দিয়েছে। সে ভাবে :

> কারো ঘুম না ভাঙাইয়া কপিলাকে কি তোলা যাইবে না? আর কিছু চায় না কুবের কপিলার কাছে, গোপনে শুধু দুটা সুখ-দুঃখের কথা বলিবে। একটু রহস্য করিবে কপিলার সঙ্গে। বাঁশের কঞ্চির মতো অবাধ্য ভঙ্গিতে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কপিলা টিটকারি দিবে তাকে, ধরিয়া নোয়াইয়া দিতে গেলে বসিয়া পড়িবে কাদায়, চাপা হাসিতে নির্জন নদীতীরে তুলিয়া দিবে রোমাঞ্চ। (মানিক, ১৯৯৫ : ৩৯৭-৩৯৮)

সন্ধ্যার পর মাঝরাত অব্দি কপিলা নদীর ঘাটে একাকী দাঁড়িয়েছিল। কুবেরের অমঙ্গল আশঙ্কা তাকে ভীতসন্ত্রস্ত হবার অবকাশ দেয়নি। কুবের ফিরলে তার 'বক্ষের আশ্রয়ে সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া' বাড়িতে পুলিশের তল্লাশি ও পীতম মাঝির চুরি যাওয়া টাকার ঘটি উদ্ধারের বৃত্তান্ত জানায়। হোসেন মিয়ার ফায়সালায় যখন কুবেরের ময়নাদ্বীপ যাওয়া সাব্যস্ত হয়, তখন 'না গেলা মাঝি, জেল খাট' বলে কপিলা নির্লোভ উদার মানসিকতার পরিচয় দেয়, যা কুবেরের প্রতি তার প্রগাঢ় প্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ। হোসেন মিয়াকে চক্রান্তকারী বিবেচনা করে কুবের যখন মনে করলো : ময়নাদ্বীপে যাওয়া ছাড়া তার আর কোনো গত্যন্তর নেই, এবং ওই রাতেই ময়নাদ্বীপে যাওয়ার জন্য সে হোসেন মিয়ার নৌকায় চড়ে বসে, তখন কপিলা তার সঙ্গী হয়। লেখকের বর্ণনা :

> ঘাটের খানিক তফাতে হোসেনের প্রকাণ্ড নৌকাটি নোঙর করা ছিল। একজন মাঝি ঘুমাইয়া ছিল নৌকায়। তাকে ডাকিয়া তুলিলে সে নৌকা তীরে ভিড়াইল। কুবের নীরবে নৌকায় উঠিয়া গেল। সঙ্গে গেল কপিলা।
>
> ছইয়ের মধ্যে গিয়া সে বসিল। কুবেরকে ডাকিয়া বলিল, 'আমারে নিবা মাঝি লগে?'
>
> হ, কপিলা চলুক সঙ্গে। একা অতদূরে কুবের পাড়ি দিতে পারবে না। (মানিক, ১৯৯৫ : ৩৯৯)

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে কুবের এবং কপিলার হৃদয়বৃত্তি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, স্বপ্ন-প্রত্যাশার মূলে ক্রিয়াশীল থেকেছে তাদের অবদমিত মনের যৌন কামনা-বাসনার তাড়না – লিবিডোই তাদের কেন্দ্রীয় চালিকাশক্তি। এ উপন্যাসে কপিলার আগমনের পর থেকে কাহিনীর গতিধারায় পরিবর্তন ঘটেছে। কুবেরের কর্মকাণ্ডে যে

পরিবর্তনগুলো সূচিত হয়েছে, তার নেপথ্যে কপিলার লীলা-লাস্য ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। তামাক নিয়ে নদীর ঘাটে গিয়ে কুবেরের সঙ্গে সে রহস্যময়ী নারীর মতো ছলাকলা আরম্ভ করে। কপিলার রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসা, কাদায় বসে পড়া এবং 'আরে পুরুষ' বলে উসকানি দেয়া কুবেরকে ভাবিত করে তুলেছে। তামাক দিতে আসা কপিলা মূলত একটু রঙ ঢঙ করে কুবেরের সঙ্গে জৈবিক সম্পর্ক স্থাপন করার প্রয়াসী। বোকা কুবের তার শ্যালিকার মতিগতি সহসা বুঝে উঠতে পারে না বলেই তার 'আরে পুরুষ' বলে উসকানি দেওয়া। কুবেরের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডের সহায়তা করে, তার সেবাযত্ন করে সে মূলত কুবেরের সুদৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিল। গোঁফ ধরে টান দিয়ে চোখের পলকে উধাও হয়ে যাওয়ার মধ্যেও রয়েছে কুবেরকে প্রলুব্ধ করার প্রয়াস। কপিলার এ সব 'সেবা-যত্ন' এবং 'শ্যালিকাসুলভ রসিকতা' ফলপ্রসূ হয়েছিল। প্রথম সন্ধ্যায় নদীর তীরে কপিলার কাদার মধ্যে বসে পড়া, হাত ধরে টানাটানি এবং 'আরে পুরুষ' বলে উসকানির অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে অনুধাবন করতে না পারলেও পরে কুবের সবই বুঝতে শুরু করে। এরপর থেকেই সে কপিলার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতে থাকে। অসুস্থ গোপীকে আমিনবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর গোপীকে দেখাশোনা করার অসিলায় কপিলার থেকে যাবার একটাই উদ্দেশ্য – কুবেরকে একান্তভাবে সে কাছে পেতে চায়। স্বামিসঙ্গবঞ্চিত কপিলার যৌনতৃষ্ণা নিবৃত্ত করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাকে পেয়ে বসেছিল।

কপিলা চরিত্রে স্পষ্টতই তিনটি পর্ব লক্ষণীয়। সন্ধ্যাবেলা নদীর ঘাটে তামাক নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে আমিনবাড়ি হোটেলে রাত কাটানো পর্যন্ত একটি পর্ব, আকুরটাকুরে স্বামিগৃহে ও চরডাঙায় বাবার বাড়িতে অবস্থানকালে দ্বিতীয় পর্ব, এবং গোপীর বিয়েতে পুনরায় কেতুপুরে আসার পর তার চরিত্রের তৃতীয় পর্ব বিভাজিত। প্রথম পর্বে কপিলা তার যৌনতৃষ্ণা নিবারণের জন্য কুবেরকে প্রলুব্ধ করেছে। দ্বিতীয় পর্বে স্বামী-সংসারে মন দিতে চেয়েছে সে। তৃতীয় পর্বে সে কুবেরের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেছে। প্রথম এবং তৃতীয় পর্বে কুবেরের প্রতি তার সমর্পণ ভিন্ন প্রকৃতির। প্রথম পর্বে সে মূলত শুধু দেহের দাবি মেটাবার জন্য ছলাকলা করেছে। এ পর্বে তার দেহ মুখ্য, মন গৌণ। তৃতীয় পর্বে দেহ গৌণ, মন মুখ্য। প্রথম পর্বে পুঞ্জীভূত যৌনক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য প্রবল আকর্ষণে সে কুবেরের দিকে ছুটে গেছে। এখানে সে Id চালিত। দ্বিতীয় পর্বে সে অবদমন করেছে। Id তাকে কুবেরমুখী করে, Super ego তাকে স্বামী-সংসার-সমাজমুখো করে। এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব তাকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। স্বামী-সংসারে সে মন দেবার চেষ্টা করেছে। Id এবং Super ego-র লড়াইয়ে তার মধ্যে জেগেছে নৈতিক উৎকণ্ঠা। আকুরটাকুরে তার কাছে কুবের উপস্থিত হয়েছিল সুবচনীর হাটে যাবার নাম করে। কুবের তার কাছ থেকে ঘনিষ্ঠতা আশা করলেও স্বামিগৃহে তার পক্ষে কুবেরের প্রত্যাশা পূরণ করা অসম্ভব ছিলো। পাট ও পাঁঠার দুর্গন্ধ কুবেরকে যতোটা পীড়া দিয়েছে, তার চেয়েও বেশি পীড়া দিয়েছে

কপিলার দূরত্ব। আশাভঙ্গ হয়ে কুবের ক্ষিপ্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যাবার প্রাক্কালে কপিলাকে যখন কটুকথা বলছিল, তখন পাছে কেউ শুনে ফেলে, এই ভয়ে কপিলা ছিলো বিব্রত। অনুরূপভাবে, চরডাঙায় পুকুরের মধ্যে কুবের যখন কপিলাকে জড়িয়ে ধরেছিল, তখনও কপিলা সমাজের ভয়ে শঙ্কিত। Id এবং Super ego-র দ্বন্দ্বে কপিলার মন জুড়ে ছিলো তখন নৈতিক উৎকণ্ঠা, তাই তার পক্ষে কুবেরের প্রত্যাশা পূরণ করা অসম্ভব ছিলো। কিন্তু তৃতীয় পর্বে কপিলা নৈতিক উৎকণ্ঠা কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়েছে বলে অবলীলায় কুবেরের সঙ্গে ময়নাদ্বীপে চলে যায়। সে দৃঢ়চিত্ত, স্থিরপ্রতিজ্ঞ। Super ego-র নিম্নচাপ উপেক্ষা করার শক্তি এ পর্যায়ে সে সঞ্চয় করেছে।

রাসু চরিত্র নির্মিতিতেও ফ্রয়েডীয় পরিকল্পনা সুস্পষ্ট। স্ত্রী-সন্তানদের ময়নাদ্বীপে বিসর্জন দিয়ে সে যখন কেতুপুরে ফেরে, তখন তার মধ্যে জীবনীশক্তি দৃশ্যত নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু মানুষ কখনো থেমে থাকার নয়। ফ্রয়েড বলেছেন, আত্মরক্ষার আকাঙ্ক্ষা এবং বংশবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা মানুষকে নিরন্তর সংগ্রামী করে। কেতুপুরে ফেরার পর গোপীকে দেখে মুগ্ধ হবার পর রাসু নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। গোপীকে দেখবার জন্য সে নির্জন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। কখনো তার হাতে তুলে দেয় উপহারসামগ্রী। তার এ সকল কর্মকাণ্ডের নেপথ্যে তার অবদমিত জৈবিক কামনা-বাসনাই কেন্দ্রীয় চালিকাশক্তি। গোপীকে হাসপাতালে নেবার সময় তার সাহায্য-সহযোগিতা, হাসপাতালে গিয়ে দফায় দফায় ডাক্তারের সঙ্গে রোগীর খোঁজখবর নেওয়া, সময়ে অসময়ে কুবেরের বাড়ি এসে কখনো গোপীর অগ্রগতি নিরীক্ষণ, কখনো কুবেরের সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিবরণ প্রদান – সবকিছুর মূলে রয়েছে গোপীকে লাভ করার আগ্রহ। পা সেরে গেলে পাছে বিয়ে না দেয়, এই আশঙ্কায় অসুস্থ গোপীকেই সে বিয়ে করার জন্য প্রস্তুত। রোগগ্রস্ত পীতম মাঝিকে সেবার নাম করে রাসু মূলত চুরি করার সুযোগ সন্ধান করেছে। গোপীকে লাভ করার জন্য সে পীতমের সঞ্চিত টাকা-পয়সা চুরি করেছে। কুবের রাসুর কাছে মেয়ে বিয়ে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দান করেছিল। সে যে পরিমাণ টাকা যৌতুক হিসেবে দাবি করেছিল, তা বাজারমূল্য অপেক্ষা বেশি হবার পরও সে পরিমাণ অর্থ প্রদানেও রাসু সম্মত হয়। অথচ তার কাছে না দিয়ে কুবের যখন বঙ্কুর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেয়, তখন রাসু প্রকাশ্যেই জানিয়ে যায় : সে প্রতিশোধ নেবে। কুবেরের ঢেঁকি ঘরে পাটখড়ির নিচে পীতম মাঝির চুরি যাওয়া টাকার ঘটিটি সে লুকিয়ে রাখে। পুলিশের ভয়ে কুবের হোসেন মিয়ার পরামর্শে ময়না দ্বীপে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

সুতরাং রাসুর যৌন জীবন এ উপন্যাসের কাহিনী-ধারাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। কেবল কুবের-কপিলার নয়, এ উপন্যাসের পরিণতি নির্ধারণেও রাসুর যৌন তৃষ্ণা পালন করেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

ময়নাদ্বীপে এনায়েত ও বসিরের তরুণী স্ত্রীর সমাজনিন্দিত প্রেমের মূলেও রয়েছে তাদের অবদমিত কামবাসনা। বৃদ্ধ বসিরের বার্ধক্য, যৌন দুর্বলতা-শিথিলতা তার তরুণী স্ত্রীকে ভেতরে ভেতরে যে অসুখী করে তুলেছে, তার প্রকাশ ঘটে এনায়েতের সঙ্গে তার আচার-আচরণে। যৌনজীবনে অতৃপ্ত, অসুখী এই তরুণী বধূটি এনায়েতকে দেখে হেসেছিল। তার হাসি এনায়েতকে প্রলুব্ধ করেছিল বলেই একদিন ভর দুপুরে সবাই যখন কাজে গেছে, তখন সে চুপিচুপি বসিরের ঘরে ঢোকে। তবে বৌটি কেন তার নাগরকে দেখে চেঁচামেচি করে উঠেছিল, তা রহস্যজনক। এনায়েতের প্রাকৃত প্রেমের নেপথ্যে তার যে সায় ছিল, তা বলাই বাহুল্য। সায় না থাকলে সে রাতের বেলা চুপিচুপি এনায়েতকে ভাত খাওয়াতে যেত না। তার প্রলোভনে-আকর্ষণে দুপুর বেলা নির্জন ঘরে এনায়েত যখন গিয়ে ঢোকে, তখন সে হয়তো ঘটনার আকস্মিকতায় ও আতিশয্যে চিৎকার করে ওঠে। পাছে পাশের বাড়ির আকবরের স্ত্রী দেখে ফেলে, এই আশঙ্কাতেও সে চেঁচামেচি করতে পারে।

হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে দরকার নবাগত শিশু সন্তান। বৃদ্ধ বসির দীর্ঘ দিনেও স্ত্রীর কোল জুড়ে শিশু উপহার দিতে পারেনি, তখন হোসেন মিয়া বসিরের স্ত্রীর সঙ্গে এনায়েতের বিয়ের ব্যবস্থা করে। সুতরাং এনায়েত এবং বসিরের স্ত্রী চরিত্রদুটিও লিবিডোতাড়িত, অবদমিত কামবাসনা দ্বারা পরিচালিত।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম জেলেদের নিয়ে উপন্যাস লেখেন। (সরোজমোহন, ২০০৮ : ১৯১) হায়দার আকবর খান রনো *পদ্মানদীর মাঝি* ও *পুতুলনাচের ইতিকথা* গ্রন্থ দুটিকে বিদেশি সাহিত্যের অনেক নোবেল প্রাইজ পাওয়া বইয়ের সঙ্গে তুলনীয় বলে বিবেচনা করেন। (রনো, ২০০৮ : ৩২১) *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় প্রভাব লক্ষ করেছেন সৌমিত্র শেখর। তাঁর ভাষায় :

> ক. *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রয়োগ বিভিন্ন চরিত্রে লক্ষ করা যাবে। শীতলবাবুর সঙ্গে কপিলার হাসি-তামাশায় কুবের ঈর্ষান্বিত হয়ে ভেবেছে : 'ওর সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া কী কথা কপিলার?' (সৌমিত্র, ২০০৮ : ৩০৫)
>
> খ. পুরাণে কুবের হলেন যক্ষরাজ ধনদেবতা; আর এ উপন্যাসে কুবের পেশায় মাঝি, অর্থনৈতিক দিক থেকে হতদরিদ্র। চরিত্রের এই নামকরণের মধ্যে সমাজের প্রতি ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কী চরম পরিহাস-সৃজন! তবে মনোরাজ্যে কিন্তু কুবের সম্রাট; কপিলার জন্যে তার 'পরাণডা পোড়ায়'। যে স্ত্রীকে নিয়ে জীবন ঠেলে কুবের, সেই মালা পঙ্গু, হাসতে জানে না। উচ্ছলতা কখনোই মালার মধ্যে ছিল না। সদাবিষণ্ন এই নারীর ঠিক বিপরীত কিন্তু কপিলা। উপন্যাসে আছে :'তার উত্তোলিত দুটি বাহু, মুখের ছলনা ভরা হাসি, বসিবার দুর্নিবার দুর্বিনীত ভঙ্গি সব পাগল করিয়া দিবে কুবেরকে'। আসলে এ সব কুবেরকে পাগল করেই রেখেছে। তাই 'নিজের এলোমেলো চিন্তাগুলিকে কুবের ভাল বুঝিতে পারে না। মাথার মধ্যে একটা ভোঁতা বেদনা টিপটিপ করিতেছে।' কুবের মাঝি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের মতো নিজের মধ্যে আরোপিত রূপতৃষ্ণা অনুভব করেনি। বরং আদিম সহজাত একটা

কামনা তার মধ্যে ছিল। এর জন্য এক প্রকার অতৃপ্তি থেকে, মালার সাহায্যে যা নিবৃত্ত করতে পারেনি কুবের। এ ক্ষেত্রে কুবের আর কপিলা প্রতীপমেরুর। তারপরও কুবের সন্তানের জনক। কিন্তু কপিলা সন্তান থেকে বঞ্চিত, স্বামীর ভালোবাসা তো অনেক দূরে! তাই সে কখনো নির্জন সন্ধ্যায় কুবেরের হাত ধরে টেনে তাকে নৌকোয় নিয়ে যেতে আব্দার করে। কুবের তার শরীরে হাত দিয়ে 'অবাধ্য বাঁশের কঞ্চির মত তাহাকে পিছনে হেলাইয়া বলে, বজ্জাতি করস যদি, নদীতে চুবান দিমু কপিলা।' কপিলা কাদার মধ্যে বসে পড়ে, বলে :'আরে পুরুষ!' সন্ধ্যায় জল-কাদায় ভেজা কপিলার এ অবস্থা দেখে কুবেরের বড়ো ভয় হয়। এ ভয় কপিলাকে নয়, সমাজকে। তাই কুবের কপিলার কাছে এ ভয় অব্যক্ত রাখে না, বলে :'মাইন্‌ষে কইব কী? যা বাড়িত যা।' কপিলাও কুবেরকে গভীরভাবে অনুভব করে, ভালোওবাসে। উপন্যাসে কুবেরের প্রতি কপিলার দুর্বলতা একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে। স্বামী শ্যামাদাসের কাছে সে অর্থবিত্ত কম পায়নি, কম পেয়েছে 'অন্য কিছু'। এই 'কিছু'র জন্য কুবেরকে সে মনে মনে কাছে চায়। কিন্তু তার পরও তাকে বলতে হয় :'যাওগা মাঝি। ক্যান আইছিলা তুমি।' এ কথা আরো স্পষ্ট হয় যখন কুবের নিজের বাহুবন্ধনে কপিলাকে রেখে বলে :'তর লাইগা দিবারাত্র পরাণডা পোড়ায় কপিলা।' তখন কপিলাকে বাধ্য হয়ে বলতে হয় :'নাও ভাসাইয়া দূর দ্যাশে যাইও মাঝি, ভুইলো আমারে। ছাড়, মানুষ আহে।' – এই 'মানুষ আহে' অর্থাৎ সমাজের ভয়ে কুবেরও কপিলাকে বলেছিল :'মাইন্‌ষে কইব কী? যা বাড়িত যা।' আসলে কুবের ও কপিলা কেউ কাউকে দূরে ঠেলে দিতে চায় না, কিন্তু বড়ো ভয় সমাজকে। – এভাবেই উপন্যাসে কুবের ও কপিলার মধ্যে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের প্রভাব দৃষ্ট হয় এবং দেখা দেয় অস্তিত্বের সংকট। (সৌমিত্র, ২০০৮ : ৩০৩-৩০৪)

গ. মেজবাবুর নৌকায় মালার হাসপাতালে গমনকেও কুবের সহ্য করতে পারেনি। মালাও নিশ্চুপ নয়। সে-ও কপিলার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছে :'কেন চুপ যাইবে? কুবেরের দরদ আছে নাকি মালার জন্যে? সেতো কপিলার মত ভঙ্গি করিয়া হাঁটিতে পারে না।' ময়নাদ্বীপে এনায়েতের সঙ্গে তরুণী স্ত্রীর সম্পর্কও ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে বিশে-ষণ করা যায়। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনতত্ত্ব ও অস্তিত্ববাদের প্রয়োগ এ উপন্যাসে ব্যক্তি থেকে সমাজ পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। (সৌমিত্র, ২০০৮ : ৩০৫)

উত্তরকালের সমালোচকদের দৃষ্টিতে কপিলা প্রবৃত্তির দুরন্ত বিলাস। (আজম, ২০০৮ : ১৮৩) গিয়াস শামীম লক্ষ করেছেন : পদ্মানদীর মাঝির কুবের-কপিলাকেন্দ্রিক ঘটনাংশ ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত। (শামীম, ২০০৮ : ৫২)

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প বিশ্লেষণ করে বায়তুল্লাহ কাদেরী দেখিয়েছেন যে এ উপন্যাসের উপমা ও চিত্রকল্পে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের রূপাভাস ঘটেছে। সমালোচকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

ক. সর্বজ্ঞ লেখকের বর্ণনভঙ্গির আলোকপ্রক্ষেপণ নদীতীরের মানুষের সরল, নিরাবয়ব বর্ণনের বদলে ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক লিবিডো-নির্ভর, জটিল দুর্বোধ্য

অঞ্চলের বর্ণনার রেখাভাস কি 'দুর্বোধ্য সংকেত' 'অস্পষ্ট সংকেত' প্রভৃতির মাধ্যমে উপমায়িত হয়েছে? বোঝা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংকেতায়িত করছেন পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে মানুষের যে যৌনাবেগ ও তজ্জনিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তারই দিকে। বস্তুত বাংলা উপন্যাসে ফ্রয়েডের মনোগুহার সংকেত এ-প্রথম মূর্ত হয়ে উঠল। মানিক-উপমার এই দিকটি নিঃসন্দেহে নতুনত্বের স্মারক। বলা প্রাসঙ্গিক, এই সংকেত উপমানটি যৌবনের উদ্দামতা, লিবিডোর গোপন ইঙ্গিত ও অপ্রতিহত প্রেরণারূপেও মানিক-উপন্যাসের একটি পুনরাবৃত্ত অনুষঙ্গ। (বায়তুল্লাহ্, ২০০৮ : ১১৮)

খ. আবার কপিলার পূর্ণায়ত দেহবল্লরী, যৌবনভারাক্রান্ত উদ্দাম লিবিডোচেতনাকে কলসির প্রতীকী চিত্রকল্পের সঙ্গে উপমিত করেন 'হাতের ঠেলায় কলসি ভাসিয়া যায় কুবেরের দিকে' বস্তুত কলসিরূপী কপিলার কুবেরমুখী আকর্ষণকে যেমন এখানে প্রতীকায়িত করা হয়েছে তেমনি উপন্যাসের পরিণামী মীমাংসা কুবেরের সঙ্গে কপিলার নৌকায় ভেসে ময়নাদ্বীপে প্রস্থানের রহস্যসঙ্কেতও এই বাক্যে উন্মোচিত। লক্ষণীয় 'হাতের ঠেলায়' কলসি ভেসে যায়; এক অজ্ঞাত ও অনির্দেশ্য হাতটানের (চুরি) অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েই কিন্তু কলসরূপী কপিলাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে কুবের ময়নাদ্বীপে। কুবের-কপিলার অবদমনের অবৈধ প্রণয়ের ভাসন্ত-ডুবন্ত রূপও মূলত কলসির মতোই – 'তেমনই ত্রাসের ভঙ্গিতে স্তন দুটি ভাসে আর ডোবে'। (বায়তুল্লাহ্, ২০০৮ : ১২২)

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে কুবের, কপিলা, রাসু, এনায়েত, বসিরের স্ত্রী – সবার হৃদয়বৃত্তি, স্বপ্ন-প্রত্যাশা ও বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মূলে সক্রিয় থেকেছে তাদের কামবাসনা। এ উপন্যাসের আখ্যানভাগ নির্মিতিতে এবং চরিত্রের মৌলিক প্যাটার্ন গঠনে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো প্রবহমান থেকেছে লিবিডোর সর্পিল প্রবাহ। চরিত্রের একান্ত যৌনজীবন তাদের বৃহত্তর জীবনধারাকে নির্মাণ করেছে।

মানুষের যৌনজীবন তার অন্যান্য জীবনের ওপর কী রকম প্রভাব ফেলে এবং তার সমগ্র জীবনের গতিধারা নির্ধারণে কী রকম নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে, 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তা আমাদের দেখিয়েছেন। সুতরাং এ কথা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, 'পদ্মানদীর মাঝি' পর্বে ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিপুলভাবে ফ্রয়েড-প্রভাবিত।

গ্রন্থপঞ্জি

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮৮)। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলিকাতা

আবু হেনা মোস্তফা কামাল (২০০১)। *পদ্মানদীর দ্বিতীয় মাঝি*, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় [সম্পা. ভূইয়া ইকবাল], বর্ণমিছিল, ঢাকা

আকিমুন রহমান (১৯৯৩)। *আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মাহবুবুল হক (২০০১), 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনপঞ্জি', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* [সম্পা. ভূইয়া ইকবাল], বর্ণমিছিল, ঢাকা

হায়াৎ মামুদ [সম্পা.] (১৯৯৫)। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, অবসর, ঢাকা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০০১)। 'পুতুলনাচ ও পদ্মানদী', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* [সম্পা. ভূইয়া ইকবাল], বর্ণমিছিল, ঢাকা

কার্তিক লাহিড়ী (২০০১)। 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* [সম্পা. ভূইয়া ইকবাল], বর্ণমিছিল, ঢাকা

রফিকউলাহ খান (২০০০)। *শতবর্ষের বাংলা উপন্যাস*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮৮)। *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, সাহিত্যশ্রী, কলিকাতা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৫)। *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস* [সম্পা. হায়াৎ মামুদ], অবসর, ঢাকা

সরোজমোহন মিত্র (২০০৮)। 'পদ্মানদীর জেলেজীবন ও ময়নাদ্বীপ', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ* [সম্পা. ভীষ্মদেব চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক], অবসর, ঢাকা

হায়দার আকবর খান রনো (২০০৮)। 'উত্তরকালের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ* [সম্পা. ভীষ্মদেব চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক], অবসর, ঢাকা

সৌমিত্র শেখর (২০০৮)। 'উপন্যাসে বৈজ্ঞানিকতা', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ* [সম্পা. ভীষ্মদেব চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক], অবসর, ঢাকা

মোহাম্মদ আজম (২০০৮)। 'কুবের মাঝির নিয়তি ও মানিকের নিয়তিসূত্র', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ* [সম্পা. ভীষ্মদেব চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক], অবসর, ঢাকা

গিয়াস শামীম (২০০৮)। 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি : কেতুপুরের মহাকাব্য', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ* [সম্পা. ভীষ্মদেব চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক], অবসর, ঢাকা

বায়তুলাহ কাদেরী (২০০৮)। 'মানিকের উপন্যাসে উপমা-চিত্রকল্প', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ* [সম্পা. ভীষ্মদেব চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক], অবসর, ঢাকা।